সমাজ পরিবর্তনের সঠিক পথের হদিশ মানুষকে দিয়েছে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

শিবদাস ঘোষ

.... ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামগুলো পরিচালনা করতে গিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গভীরভাবে স্মরণ করা দরকার। আমাদের মধ্যেও যাঁরা এগুলি জানেন এবং বোঝেন, বা যাঁরা কিছু কিছু জানতেন কিন্তু ভুলে বসে আছেন, তাঁদের সকলেরই পুনরায় নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলো স্মরণ করা দরকার। সেগুলো পুনরায় ভাল করে তাদের অধ্যয়ন করা ও তার মধ্য দিয়ে নিজেদের চিন্তাভাবনার মধ্যে যে জড়তা এবং বিভ্রান্তি এসেছে, সেগুলো দূর করা দরকার। ...

লড়াই এদেশে অনেক হয়েছে, আপনারা যারা আরও বহুদিন বাঁচবেন, লড়াই তাঁরা চান বা না চান, লড়াই তাঁদের অনেকবার প্রত্যক্ষ করতে হবে। লড়াই আসবে, মার খাওয়া মানুষগুলো, নেতৃত্ব দেওয়ার লোক না থাকলেও, একটা সময়ের পর নিজেরাই বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, তাদের মধ্যে থেকেই একটা যেমন তেমন নেতৃত্ব এসে যাবে। কিন্তু, যেমন তেমন নেতৃত্ব যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যায়, তার দ্বারাও শেষপর্যন্ত কিছু হয় না। তাদের আবার মার খেতে হয়, আবার হতাশা আসে, আবার বিভ্রান্তি আসে।

এই হতাশা ও বিভ্রান্তির আসল কারণ হল, আমাদের দেশের মূল সমস্যা যা, তা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, নীতিগত প্রশ্ন আজও অপরিষ্কার রয়ে গেছে। এখনও তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। জনসাধারণের মঙ্গল করতে হবে, দেশের অগ্রগতি ঘটাতে হবে, এসমস্ত কথাগুলোই ঠিক। সকলেই একথা বলছে। আজকালকার দিনে মানুষ যেমনভাবেই হোক, সঠিকভাবে না হলেও খানিকটা ভাবছে, কথা বলছে। গ্রামের চাষি-মজুর যাদের আগে মানুষ বলেই গণ্য করা হত না, তারাও তাদের মতো করে মাথা ঘামাচ্ছে। এরকম অবস্থায় চাষি-মজুরের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য নানান মনভোলানো পরিকল্পনা বা উগ্র স্লোগান প্রত্যেকেই দিচ্ছে, যার যেমন না দিলে আজকালকার দিনে আর কেউ রাজনৈতিক দল হিসাবে জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব বা প্রভাব বজায় রাখতে পারছে না। তাই এসব কথা সব দলই বলছে। কিন্তু, শুধুমাত্র এর দ্বারা আমাদের দেশের মূল সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শগত এবং নীতিনৈতিকতা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণা প্রয়োজন, তা পরিষ্কার হয় না। অর্থাৎ, মূল যে কথাটা অপরিষ্কার থেকেই যায়, তা হল, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সমাজব্যবস্থায় আমরা বসবাস করছি, সেটা কোন নিয়মের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এল। এটা তো একদিনে হঠাৎ করে আসেনি। স্তরে স্তরে সমাজ পরিবর্তিত হতে হতে এ জায়গায় এসেছে। তার একটা ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম আছে। সেই নিয়মটি কী? দ্বিতীয়ত, ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থার চরিত্র কী? ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ কী? রাষ্ট্রের চরিত্র কী? সর্বোপরি, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কী সেই নৈতিকতা ও আদর্শবাদ যা ভারতবর্ষের জনগণের মানসিকতাকে পরিচালিত করছে? সেটা কি সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক অবশ্যপ্রয়োজনীয় নৈতিকতা ও আদর্শবাদের ধারণা? এইগুলো যদি আমাদের জানা না থাকে, যদি বিভ্রান্তি থাকে, যদি এ সম্পর্কে নানান মনগড়া তত্ত্ব থাকে, অনৈতিহাসিক তত্ত্ব এবং ধারণা থাকে, আর সেই ধারণার উপরই আমরা যদি গায়ের জোরে বিষয়গুলো বুঝতে চাই, কিংবা সমাজটাকে পাল্টাতে চাই, সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করতে চাই— তবে তা কি সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়। অথচ, আমাদের দেশে সমাজ পরিবর্তনের নামে হচ্ছেও ঠিক তাই।

অনেকেই বলছেন, মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো এই সমাজ থেকে, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা থেকে জন্ম নিচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, না, তা নয়। তাঁরা আবার সব নানান মনগড়া তত্ত্ব চালাবার চেষ্টা করছেন। সে যাই হোক, যাঁরা সমাজব্যবস্থাকেই সমস্যার মূল কারণ হিসাবে বলছেন, তাঁরাও কিন্তু তা ভাসাভাসাভাবে বলছেন, অত্যন্ত সাধারণভাবে বলছেন। এইসব ভাসাভাসা কথা দিয়ে হবে না। বুঝতে হবে, কী সেই সমাজ এবং কীভাবে সেই সমাজ থেকে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। এটা যদি জানা যায়, তবেই কীভাবে সেই সমাজকে পরিবর্তিত করতে হবে, তার জন্য তাকে আঘাত কোথায় দিতে হবে, সেটাও ভালভাবে বোঝা

যাবে।

যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভারতে বর্তমানে যে সমাজকাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থাটি টিকে আছে, তার থেকেই সমস্ত সমস্যার জন্ম হচ্ছে, যাঁরা এটাকে বিপ্লবের মারফত পরিবর্তিত করতে চান, দ্রুত আমূল পরিবর্তন আনতে চান, বিপ্লবের দায়িত্ব সত্যিই পালন করতে চান, বিপ্লবের কথা বলে মানুষকে খানিকটা গরম করে দিয়ে ভোলাতে বা বিভ্রান্ত করতে চান না, তাঁদের প্রথমেই যেটা বিচার করে বুঝে নিতে হবে, তা হচ্ছে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আর কোনও প্রগতিশীল ভূমিকা আছে, নাকি তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে বর্তমান ব্যবস্থাটা প্রগতির দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে? এই সমাজব্যবস্থাটার চরিত্র কী? সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান কী? বিপ্লবের মারফত কাকে উচ্ছেদ করতে হবে, কাকে বসাতে হবে? দ্বিতীয়ত, যে প্রশ্নটা আসে, তা হল, সমাজব্যবস্থাটা কীভাবে পাল্টাবে? তার রাস্তাটা তো আমার আপনার মনগড়া ধারণার দ্বারা নির্ধারিত হবে না।

আগেই বলেছি, সমাজ পাল্টাবার একটা ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত রাস্তা আছে। এই রাস্তাটার হদিস প্রথম মানুষকে দিয়েছে মার্কসবাদ। আবার, আজকের যুগে, অর্থাৎ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার যুগে, আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের যুগে যাঁরাই নিজেদের মার্কসবাদী বলেন, তাঁরা মার্কসবাদের সঙ্গে লেনিনবাদ কথাটা যুক্ত করে বলেন যে, এযুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে সমাজবিপ্লবের একমাত্র হাতিয়ার। এই হাতিয়ার কথাটার অর্থ কামান-বন্দুক-পিস্তল-বোমা নয়, এ তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই হাতিয়ারটি আয়ত্ত করতে পারলে জনসাধারণের মধ্যে চেতনার এমন মান, এমন তেজ, এমন সংগঠন শক্তি, এমন পরিকল্পনা শক্তি দানা বেঁধে ওঠে, যার জোরে শোষিত মেহনতি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে পারে— কামান-বন্দুকের পাহাড় জমা করে যারা শোষিত মানুষের লড়াইকে বাধা দিতে আসে, তারা তার হদিশ পায় না।

তাই মার্কস থেকে শুরু করে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ সকলে একবাক্যে বলেছেন, সর্বহারার হাতে, শোষিত মানুষের হাতে অ্যাটম বোমা, নাপাম বোমার চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কারণ, এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদই মানুষকে জানতে ও বুঝতে শেখায় তার জীবনের সত্যিকারের সমস্যাগুলোকে, সেই সমস্যাগুলোর চরিত্র ও মূল কারণকে। অন্য সমস্ত মতবাদ শুধু কথার বাঁধুনি দিয়ে, সুললিত ভাষা ও ভঙ্গি দিয়ে, মিষ্টি মধুর কথা ও স্লোগানের আড়ালে মানুষের জীবনের আসল সমস্যাগুলোকে চাপা দিতে ব্যস্ত, মানুষের দৃষ্টিকে বিপথগামী করতে ব্যস্ত। এদের কাজ হল, যা সত্য নয়, তাকেই সত্য বলে বুঝিয়ে মানুষকে নিরস্ত রাখার চেষ্টা করা। আর, কোথায় রোগ, কোথায় সমস্যার মূল কারণ নিহিত এবং এই সমাজ যেটা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সেই পরিবর্তনের নিয়ম কী, তা ধরতে ও বুঝতে শেখায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

এই নিয়মকে জানতে পারলেই একমাত্র মানুষের পক্ষে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকে সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করা সম্ভব। যেমন, একজন বিজ্ঞানী প্রকৃতির কোনও শক্তিকে তখনই বশীভূত করতে পারে, যখন প্রকৃতির কোন কার্যকলাপ কোন নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই অন্তর্নিহিত নিয়মকে সঠিকভাবে সে আবিষ্কার করতে পারে, জানতে পারে এবং বুঝতে পারে। যখন এই পরিবর্তনের নিয়মকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয়, তখনই একমাত্র সেই পরিবর্তনের ধারায় এবং পরিবর্তনের নিয়মকে মেনেই প্রকৃতির শক্তি, বস্তুর শক্তি বা সমাজকে, মানুষ নিজের প্রভাব বিস্তার করার দ্বারা, তার কর্মের দ্বারা পরিবর্তিত করতে পারে। তার আগে পর্যন্ত পরিবর্তন করবার, সমাজের অবস্থা বদলাবার, মানুষের অগ্রগতি ঘটাবার সমস্ত চিন্তাই হল নিছক কল্পনা, ব্যক্তির নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত মনগড়া ধ্যানধারণা। এর দ্বারা লোকঠকানো হয়, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার অপচয় হয়, সমস্ত লড়ালড়ি মিথ্যা হয়, তার দ্বারা সমাজ পরিবর্তিত হয় না। এই সত্যটা মানুষের সামনে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানই সর্বপ্রথম তুলে ধরেছে।

মার্কসবাদ আসার আগে পর্যন্ত মানুষের অবমাননা কেন ঘটছে, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার কেন ঘটছে, মানুষের মধ্যে কেন নীচতা-হীনতা দানা বাঁধছে— এসব নিয়ে যাজক-পুরোহিত সম্প্রদায়, সাধুসন্ন্যাসী, ধর্মপ্রচারক থেকে শুরু করে বড় বড় চিন্তাশীল বহু মানুষ ভেবেছেন, এসব হটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে দুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে বিপ্লব অবশ্য প্রয়োজন, সেই বিপ্লবের রাস্তার তাঁরা সন্ধান দিতে

পারেননি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজতন্ত্রের কথাও বলেছেন। কিন্তু সেগুলো হয় কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, না হয় একটা স্থূল সমাজবাদী ধারণা, একটা মধুর কল্পনা যে, সব মানুষ সমান হয়ে যাবে, সবাই একই রকম খাবে-পরবে। অর্থাৎ, সব মানুষকে সমান করে দিতে হবে, সব ঈশ্বরের সন্তান, এমন একটা চিন্তা তাঁদের মধ্যে কাজ করেছে। সমাজতন্ত্রের নামে, মানুষের কল্যাণ করার নামে এইরকম একটা অবাস্তব, অনৈতিহাসিক, অবৈজ্ঞানিক, কাল্পনিক মধুর স্বপ্ন তুলে ধরে, তাই নিয়ে কিছু লোক অনেক হইচই করেছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। মানুষের অবস্থা, সমাজের অবস্থা তারা পাল্টাতে পারেনি। কারণ, সমাজের চলবার নিয়ম, সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম— এসব কিছুই তারা জানত না, এগুলো প্রথম সঠিকভাবে জানিয়েছে মার্কসবাদী বিজ্ঞান।

সমাজের অগ্রগতি এবং পরিবর্তনের ধারা কী, মজুর কেন সৃষ্টি হল, কীভাবে সৃষ্টি হল, কী পদ্ধতিতে পুঁজিবাদ এল, কী পদ্ধতিতে তার ক্ষয় ধরেছে— সেই পদ্ধতি বা নিয়মগুলো না জানতে পারলে এবং সমাজব্যবস্থার যে দিকগুলো খালি চোখেই দোষের বলে দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে কিছু হাকিমি-টোটকা দিয়ে সারাবার চেষ্টা করা হলে রোগ সারবে না। রোগী মারা যাবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ চিকিৎসার উপায় হল, রোগের কারণ নির্ণয়। তা হলে, সমাজের সমস্যাগুলোর মূল কারণটাকে জানতে হবে। জানতে হবে, সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব নিয়ম কী কাজ করছে লোকচক্ষুর আড়ালে। সমাজের মধ্যে, সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত নিয়ম, অর্থনীতির মধ্যে নিহিত নিয়ম, রাষ্ট্রনীতির বিকাশের মধ্যে নিহিত নিয়ম— এই নিয়মগুলিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই মার্কসবাদী বিজ্ঞান।

এই বিজ্ঞান যদি শ্রমজীবী জনগণ একবার আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে তারা সত্য জেনে ফেলবে, সমাজকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবে। তখন তাদের সংগ্রামকে আর কামান-বন্দুক দিয়ে শেষ করে দেওয়া যাবে না। তাই দেখবেন, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী লড়াইয়ের বিরুদ্ধে কামান-বন্দুক নিয়ে যতই আসুক, ক্রমাগত যে জিনিসের উপর তারা তাদের প্রধান আক্রমণ চালায়, তা হল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। বুর্জোয়াদের এই আক্রমণের কৌশল হচ্ছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে দাও, বিপথগামী করে দাও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামেই এমন সব জিনিস চালাতে থাক, যাতে আসল বিজ্ঞানটা চাপা পড়ে যায়, মার্কসবাদের মূল ধ্যানধারণা এবং তার মর্মবস্তুটি চাপা পড়ে যায়। ওরা দেখছে, ক্রমাগত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রভাব বাড়ছে। এটা হবেই। কারণ, মানুষের মধ্যে মুক্তির যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা, সেটাই তাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি টেনে নিয়ে যায়। ...

('বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্কসবাদী বিজ্ঞান' রচনা থেকে)